হালদার মৎস্যক্ষেত্র ঃ বিপর্যয়ের মুখে একটি বৈশ্বিক উত্তরাধিকার

মু. সিকান্দার খান*

সারসংক্ষেপ

হালদা নদীর মৎস্যক্ষেত্র রুই কাতলার পোনা উৎপাদনের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু পোনা উৎপাদন ১৯৪০ এর দশকের তুলনায় এখন ১/২১ অংশে নেমে এসেছে। মৎস্য উৎপাদনেও ধস নেমেছে। নদীতে মাছ ধরতে কোন প্রকার আদায় দেয়া অথবা অনুমতিপত্র নেয়ার আইন বলবৎ না থাকলেও কার্যতঃ মৎস্যজীবীদের স্থানবিশেষে মাছ ধরার জন্য আদায় দিতে হয় সরকারী এবং বেসরকারীভাবে হালদা নদীর উপর অনেকবার হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু এর বিরূপ প্রভাব কোন পক্ষই বিবেচনায় আনেননি। হালদার মৎস্যজীবীরা বাংলাদেশের অন্যান্য আভ্যন্তরীন মৎস্যক্ষেত্রে নিয়োজিত মৎস্যজীবীদের মত সমাজের নিম্নস্তরের লোক এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রায় সম্পদহীন দরিদ্র। প্রথাগতভাবে সংরক্ষণ নিয়ম পালনে অনভ্যস্তনতুন একশ্রেণীর মৎস্যশিকারে আগমনে নদীতে ক্ষতিকর জাল ও যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে গেছে। ঐতিহ্যবাহী জেলেদের মধ্যেও তা দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে। ডিম সংগ্রহকারীদের মধ্যে মাছের যত্ন এবং পোনা ব্যবসায়ে সততা উপেক্ষিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় হালদার মৎস্যক্ষেত্র ২০০২ সালে সংশোধিত ১৯৫০ সালের মৎস্য নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ দ্বারা পরিচালিত। আইন প্রয়োগে সরকারী আয়োজন ও ঐকান্তিকতার ঘাটতি এবং আইন প্রতিপালনে সংশিষ্ট পক্ষগুলির অমনযোগের ফলে হালদার মৎস্যক্ষেত্র আজ ধ্বংসের মুখে। কিন্তু হালদার মৎস্যক্ষেত্র পুণরুদ্ধার এখন সরকারের মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি উন্নয়ন লক্ষ্য। হালদার সকল স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন হ্রদ ও নদীতে পরিচালিত সমাজিক মৎস্য প্রকল্পের আদলে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানই এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সাফল্য বয়ে নিয়ে আসতে পারে।]

হালদা নদীর মৎস্যক্ষেত্র

নদী মাতৃক বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের একটি প্রধান নদী হালদা। উৎপত্তিস্থল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়নগরে। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার আন্ধারমাণিক সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মোটামুটি উত্তর থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. এলাকা জুড়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে কালুরঘাটের নিকট কর্ণফুলি নদীর সংগে মিশেছে। উত্তরে ফটিকছড়ির কিছু অংশ পার হয়ে নদীটি একদিকে (বাম) রাউজান এবং অন্যদিকে (ডান) হাটহাজারী এবং সর্বশেষে চান্দগাঁও থানার কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত। প্রতিবছর বর্ষায় উপরের পাহাড়ী অঞ্চলের প্রভূত জলরাশি সাগর সঙ্গমে বঙ্গোপসাগরে ধাবিত হয়ে এই নদীতে তীব্র স্রোতের সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

গতি পথের প্রায়বৃত্তাকার বিশেষ বিশেষ অংশে এ জলরাশির ক্ষুরধারা ঘূর্ণির আকারে প্রবাহিত হওয়ার ফলে মৎস্য প্রজননের জন্য এক প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় । হালদার সকল অংশ এবং সংলগ্ন অন্যান্য নদী (চানগালী, সাংগু, কর্ণফুলী) থেকে এ সময় এ প্রজনন ক্ষেত্রে মা মাছদের আগমন ঘটে । এপ্রিলের শেষাংশ থেকে জুন মাস অবধি বিভিন্ন সময়ে কয়েকবার এ নদীতে কার্প গোত্রীয় মাছেরা ডিম ছাড়ে । সেখান থেকে নিষিক্ত ডিম আহরণ করে নদীর ধারে বিশেষভাবে নির্মিত মাটির খাদে দেশীয় প্রযুক্তিতে মাছের রেনু পোনা ফুটানো হয় । প্রাকৃতিক উৎস থেকে ইন্ডিয়ান কার্প গোত্রের মাছের নিষিক্ত ডিম আহরণ ও পোনাফোটানোর ব্যবস্থা উন্মুক্ত পরিবেশে আর কোথাও আছে বলে জানা নাই । হালদা বাংলাদেশের বৈশ্বিক উত্তরাধিকার ।

এখানকার রেনুপোনা পুকুরে লালন করে স্থানীয়ভাবে মাছের অঙ্গুলী পোনা তৈরী করা হয় । তখন এ পোনা মৎস্য চাষের জন্য পুকুরে ছাড়া যায় । অতীতে হালদার পোনা বাংলাদেশ অঞ্চলের শতকরা আশি ভাগ মৎস্য চাষের চাহিদা মিটাত । কিন্তু ১৯৫০ এর দশক থেকে এ প্রজনন ক্ষেত্রটি বিভিন্নভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে । ফলে এখানকার পোনা উৎপাদন দারুণভাবে বিঘ্নিত হয় । একটি হিসাব অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪৫ সালে ২৪৭০ কে.জি. থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৫ সালে ১২০ কে.জি.তে দাঁড়ায় । মৎস্য প্রজনন ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও হালদার বিশেষ অবদান রয়েছে । বোয়াল, পাঙ্গাস, আইড়, পাবদা, টেংরা, গলদা, ফাইস্যা প্রভৃতি মাছের জন্য এ নদী নিকট অতীতেও প্রসিদ্ধ ছিল । কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে । (টেবিল -১) ।

টেবিল ১ ঃ দশক ওয়ারী দৈনিক মাথাপিছু ধৃত মৎস্যের পরিমাণ

পরিমাণ (কে.জি.)	১৯৭০-৮০	১৯৮০ - ৯০	১৯৯০ -২০০০	২০০০-২০০৫
১-২	০	০	৪	৩৪*
২-৫	৩	৩	১৪*	২
৫-৯	১	৮*	১০	৭
৯-১৪	৮*	৪	৮	১
১৪-২০	১	১	২	০
২০-৩৫	১	১	০	০
মোট	১৪	১৭	২৮	৪৪

টীকা ঃ ১ । তারকা চিহ্নিত সংখ্যার পর্যায়ক্রমিক পরিমানগুলি সংশ্লিষ্ট দশকের মৎস্য শিকারের প্রচুরক পরিমাণ নির্দেশ করছে ।

২ । ২০০০- ২০০৫ সালের মোট ৪৪ জন জেলের মধ্যে বিভিন্ন দশকে বিভিন্ন সংখ্যক মৎস্যশিকারী এ পেশায় নিয়োজিত ছিল বলে জরিপে দেখা যায় । তাই বিভিন্ন দশকের মৎস্য শিকারীর মোট সংখ্যা বিভিন্ন ।
৩ । মাছের পরিমাণের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর শ্রেণী ব্যাপ্তি করা হয়েছে । কারণ, স্মৃতিনির্ভর রিপোর্টিং এ বড় পরিমাণ মাছ ধরার সুনির্দিষ্ট হিসাব প্রদানে জেলেরা সংশায়পন্ন ।

*পাদটীকাঃ বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও অন্যান্য তথ্যগুলি একটি দ্রুত জরিপ ও দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে সংগৃহীত । সর্তারঘাট থেকে কালুরঘাট পর্যন্ত অঞ্চলকে ৬টি অংশে ভাগ করে Stratified Random Sampling মাধ্যমে বাছাই করে ডিম আহরণকারী ৬৩ টি ও মৎস্য শিকারী ৪৪টি খানার মধ্যে এ জরিপ ২০০৫ সালের নভেম্বর - ডিসেম্বর মাসে পরিচালিত হয় ।

জরিপে দেখা যায় যে, ১৯৭০-৮০ দশক থেকে মাথাপিছু উৎপাদনের প্রচুরক পরিমাণ দৈনিক ৯-১৪ কেজির জায়গায় এ শতাব্দীর শুরুর দশকে ১-২ কেজিতে নেমে এসেছে।* অন্য একটি হিসাব মতে ১৯৭০ এর দশকে একজন জেলে যে পরিমাণ মাছ দৈনিক ধরতে পারত আজ সে পরিমাণ মাছ ধরতে ৮ জন জেলের প্রয়োজন।

এ রকমের উৎপাদন হ্রাস আরও প্রকট হয়ে উঠে যখন বলা হয় যে অতীতের চেয়ে বর্তমানের মাছ ধরার কৌশল অনেক বেশী পুঁজি-নিবিড় হয়ে গেছে। বিভিন্ন ক্ষতিকর সুতা দিয়ে ঘর গুলি প্রয়োজনমত হ্রাস বৃদ্ধি করে তৈরী জালগুলি এখন ব্যবহার করা হয়। এ জালগুলির ঘর খুবই ছোট যেখান দিয়ে ১ ইঞ্চি আকারের ছোট/শিশু মাছও গলিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া, নদীর ধারে মাছের চারণ ক্ষেত্রও জাল পোতার জায়গা থেকে বাদ পড়ে না। এ সব জালের বিস্তৃতি খুবই ব্যাপক। জালের বিভিন্ন খন্ডগুলোকে জোড়া লাগিয়ে একটানা নদীর পুরো বিস্তার জুড়ে এ সব জাল ফেলে রাখা হয়। ফলে দিনে দিনে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। অনেক জেলে মাছ ধরার আয় থেকে জীবিকা উপার্জন করতে পারছেনা।

এককালে হালদা নদীর মাছ নদীর দুধারের বসতির প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরেও সরবরাহ করা যেত। হালদার গলদা, পাবদা, টেংরা আইড় ও বোয়াল এ নদীর বিভিন্ন খালের মাধ্যমে দূরবর্তী লোকালয়ে ও ধরা পড়ত। সে সব খালের অনেকখানি মরে গেছে। যেটুকু আছে তাতেও মাছের আকাল। স্থানীয় বাজারে যে সব মাছ এখনও পাওয়া যায় সেগুলোর বর্তমান দামের সংগেও ১৯৯০ সালের দাম তুলনা করলে বাংলাদেশের যেকোন অংশের মত এখানেও মাছের আকালের একই দৃশ্য ধরা পড়বে যদিও এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এখনও হালদা প্রবহমান। (টেবিল -২)।

এ নদীতে এখনও কার্প জাতীয় মাছ ধরা পড়ে। তবে নানা কারণে স্থানীয় বাজারে সেগুলো বিক্রয় হতে দেখা যায় না। ভিন্ন জায়গার (ভারত, মিয়ানমার) একই প্রজাতির রুই কাতলা বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের মত এখানকার বাজারেও নিয়মিত মেলে।

টেবিল ২ ঃ ১৯৯০ সালে ও বর্তমানে স্থানীয় বাজারে হালদার মাছ।

মৎস্য	কেজি প্রতি দাম (টাকায়)	
	১৯৯০	২০০৫
গলদা (১৫ টি / কেজি)	৮০	৪০০-৪৫০
চিংড়ি	১৫	-
পাবদা	৬০	৩০০
ফাইস্যা	৩৫	১২০
ট্যাংরা	৩৫	১২০
আঁইড/ বোয়াল	৩৫	১২০
বাইলা (ইধরষধ)	২০	১০০
পুঁটি	১৫	৬০
কাসকি (কধংশর)	১০	৫০
সিরিং (ঈযবৎরহম)	২০	১০০
টোডা লাখ্যা (চৎধহি)	২৫	২০০

হালদার ব্যবস্থাপনা

হালদা এককালে (১৭৯৩-১৯৪৭) ছিল জমিদারদের সম্পত্তি। ১৯৫০ সালের পূর্ব বঙ্গ সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও স্বত্ব আইনের আওতায় এ নদী সরকারের খাস জমিতে রূপান্তরিত হয়। তখন থেকে সর্বোচ্চ ডাকের বিনিময়ে নীলামে বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ এ নদীর ইজারা লাভ করেন। নদীর মাছ ধরার অধিকার চলে যায় তাদের হাতে। তারা কখনও ধৃত মাছের অংশ এবং কখনও নগদ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জেলে পেশার লোকজন দিয়ে মাছ ধরত। ১৯৮০ র দশকে নতুন মৎস্যক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা নীতির মাধ্যমে এ রকম নীলামে অংশ গ্রহণের অধিকার মৎসজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু এ নীতি এখানে চালু করা হয়নি। বর্তমানে এখানে যে কেউ মাছ ধরতে পারে। কাউকে কোন রকম খাজনা এ বাবদে দিতে হয় না। এক কথায়, এটি এখন উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার সম্পন্ন একটি সম্পদ। ফলে নদী ব্যবস্থাপনায় কার্যতঃ কোন স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের কারণে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নদীর ভাগ্যে যে বিপর্যয় ঘটেছে তাকে tragedy of the commons বলেই বর্ণনা করা যায়। (১)

পুরণো মহাজন ইজারাদারদের কেউ কেউ এখনও নদীর অংশ বিশেষ (কুম) মাছ ধরার জন্য দরিদ্র পেশাদার জেলের নিকট ইজারা দেয়ার ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। নদীর দু'ধারের বসবাসকারি ধানী জমির মালিকরা নিজ নিজ জায়গা বরাবর নদীর কিনারায় ঘিরা জাল পুতে মাছ ধরে। যে সব পরিবার তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল এবং মাছ ধরার মত ছোট কাজে নিয়োজিত হতে চায় না তারা তাদের অংশ অন্য কাউকে জাল বসাবার জন্য ভাড়া দেয় এবং পরিবর্তে উৎপাদনের অংশ আদায় করে। এতে আইন যাই বলুক নদীতে একধরণের বাস্তব (de facto) ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্ব খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। এ ভাবে নদীর খালগুলিতেও ব্যক্তিমালিকানা পাকাপাকিভাবে তৈরী হয়ে আছে। সমাজের প্রতিপত্তিশালীরা কাঁটা দিয়ে খালের বিভিন্ন অংশ দখলে রাখে। এ কাঁটাগুলি মৎস্য একত্রীকরণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্ঠি করে। দিনের পর দিন নির্দিষ্ট কাঁটাগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানায় থাকতে থাকতে সেগুলিতে ঐ সকল ব্যক্তির অধিকার স্থায়ী হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষও তা মেনে নিয়েছে।

নদীর প্রায়বৃত্তাকার অংশগুলির কোন কোনটি নদী ভাঙ্গনের কারণে বসতি এবং শস্যভূমির ক্ষতির কারণও হয়ে উঠে। এ ক্ষতি ঠেকাবার উপায় হিসেবে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় উদ্যোগে জলস্রোত সরল রেখায় প্রবাহিত করার জন্য খালকাটার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে এ রকম কিছু বক্র অংশ নদীর মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে সব অঞ্চলে মৎস্য প্রজনন বিঘ্নিত হয়েছে। প্রজনন ক্ষেত্র স্থানান্তরিত হয়ে এখনও যেখানে বক্রাকৃতি অংশের ক্ষতি সাধন করা হয়নি সেখানে চলে গেছে। ডিম সংগ্রহ ও পোনা ফোটানোর পেশায় নিয়োজিত স্থানীয় সম্প্রদায় এভাবে নদীর মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র পরিবর্তন ও সংকোচনের বিষয়টি সাধারণ্যে ব্যাখ্যা করে থাকেন। উল্লেখ্য, প্রায় পাঁচটি এরকম অর্ধবৃত্তকার অংশের মধ্যে এখন মাত্র একটিই অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এ ছাড়া গত শতকের আশির দশক থেকে এ নদীর অত্যন্ত সম্পদশালী ১২টি খালের মুখে স্লুইস গেইট নির্মান করেছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন সংস্থা। মৎস্য সম্পদের উপর এর প্রভাবের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকায় এগুলো নির্মাণের ফলে মৎস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে নিয়মিতভাবে গেইট খোলা এবং বন্ধ রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় এর কোন সুফল এলাকার কৃষিতে পড়ে নি। সরকারের মৎস্য বিভাগের সংগে পানি উন্নয়নও কৃষি বিভাগের সমন্বয়হীনতার কারণে এখন প্রায় বিকল এই স্লুইস গেইটগুলি কারও উপকারেও আসছে না।

হালদার মৎস্যজীবি

হালদার দু'ধরনের উৎপাদনের সঙ্গে দু'শ্রেণীর মৎস্যজীবী সনাক্ত করা যায়। প্রথমটি ডিম সংগ্রহ রেনু ফেটানো, ও পোনা পালনের কাজ করেন এবং দ্বিতীয়টি মৎস্য শিকার করেন। যদিও এই দু'সম্প্রদায়ের অনেককেই উভয় কাজে অংশ নিতে দেখা যায় তবুও তারা এ দু'টির একটিকেই তাদের পেশা বলে উল্লেখ করেন। বস্তুতপক্ষে আমাদের জরিপে ডিম সংগ্রহকারী এক তৃতীয়াংশ খানার প্রধানগণ মৎস্যশিকারকে তাদের দ্বিতীয় পেশা এবং মৎস্যশিকারী অর্ধেক খানাপ্রধানগণ ডিম সংগ্রহকে তাদের দ্বিতীয় পেশা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাটহাজারী ও রাউজানের থানা মৎস্য অফিসের দেয়া হিসাব অনুযায়ী অধিকাংশ পোনা উৎপাদনকারী হাটহাজারী ও অধিকাংশ মৎস্য শিকারী রাউজানের অধিবাসী। (টেবিল -৩)

আমাদের জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৩ জন পোনা সংগ্রহকারী হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভূক্ত এবং ৪৪ জন মৎস্যশিকারী মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। (টেবিল -৪)

টেবিল ৩ ঃ হালদা নদীর জেলে ও পোনা আহরণকারী সম্প্রদায়

মৎস্য ক্ষেত্র	হাটহাজারী	রাউজান	মোট
পোনা আহরণ	৩৬৭ (৬৫)	২০০ (৩৫)	৫৬৭ (১০০)
মৎস্য শিকার	৩২৫ (৩০)	৭০০ (৬৭)	১০২৫(১০০)
মোট	৬৯২ (৪৩)	৯০০ (৫৭)	১৫৯২ (১০০)

টীকা ঃ বন্ধনীর মধ্যেকার সংখ্যা শতাংশ জ্ঞাপক।
সূত্র ঃ হাটহাজারী ও রাউজান থানা ফিসারিজ অফিস, নভেম্বর ২০০৫

উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা মৎস্যশিকারে সাধারণত অংশ গ্রহণ করে না। অবশ্য, হালদায় তাদেরকে বড়শি (চিংড়ী) এবং টানা জাল ফেলতে দেখা যায়। নদীর পাড়ে তাদের বসতি। পুরুষ পরম্পরায় তারা একাজের সঙ্গে জড়িত এবং এ পর্যন্ত আহরণ ও পোণা ফোটানোর মত কাজগুলি পিতৃপুরুষের কাছ থেকে শেখা।

জরিপে অংশগ্রহণকরী খানার প্রধানদের বিপুল অংশ অল্পবয়সে একাজে এসেছেন বলে জানিয়েয়েছন। (টেবিল - ৫)

ডিম সংগ্রহে সকল সম্প্রদায়ই প্রাচীনকাল থেকে সম্পৃক্ত থেকেছেন। এক্ষেত্রে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ১৯৫০ এর দশক বা তারও আগে থেকে একাজে এসেছেন। কিন্তু মৎস্য শিকারে শুধু ঐতিহ্যবাহী জলদাশ পরিবারই প্রাচীনকাল থেকে এ কাজে নিয়োজিত। (টেবিল-৬) মুসলমানদের এ ক্ষেত্রে আগমন ১৯৮০ দশক থেকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ডিম সংগ্রহকারীদের তুলনায় মৎস্য শিকারীরা অনেক পিছেয়ে আছে। (টেবিল -৭)।

টেবিল ৪ ঃ মৎস্যজীবীদের পরিবার সমূহের খানা প্রধানের ধর্ম

পোনা আহরণকারী				মৎস্য শিকারী			
মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	মোট
২৪	২২	১৭	৬৩	১০	৩৪	-	৪৪
(৩৮)	(৩৫)	(২৭)	(১০০)	(২৩)	(৭৭)		(১০০)

সূত্র ঃ মাঠ জরিপ, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৫ ।

টেবিল ৫ ঃ খানা প্রধানদের নিজ নিজ পেশায় প্রথম অংশগ্রহণের সময় বয়স

প্রথম অংশগ্রহণের সময় ও বয়স	১০-১৫	১৫-২০	২০-তদুর্ধ	মোট
ডিম আহরণকারীর সংখ্যা	৫১ (৮৪)	৮ (৯৩)	৪ (৭)	৬৩ (১০০)
মৎস্যশিকারীর সংখ্যা	২১ (৫৭)	১৮ (৪১)	৫ (০২)	৪৪ (১০০)
মোট	৭২ (৭০)	২৬ (২৪)	৯(০৬)	১০৭ (১০০)

টীকা ঃ বন্ধনীর মধ্যেকার সংখ্যা শতাংশ জ্ঞাপক ।

সূত্র ঃ মাঠ জরিপ, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৫ ।

নিরক্ষতার হার ডিম সংগ্রহ ব্যাপৃত পরিবারের সদস্যদের (২২%) তুলনায় মৎস্যশিকারীদের (৪০%) মধ্যে বেশী । তুলনামূলকভাবে এদের মধ্যে পড়তে ও লিখতে পারে এমন সদস্য সংখ্যা (২০%) অবশ্য ডিম সংগ্রহকারীদের (১৪%) চেয়ে বেশী । কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এরা (৪০%) ডিম সংগ্রহকারীদের (৬৪%) চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে ।

লেখাপড়ার সকল স্তরেই মহিলারা পুরুষদের চেয়ে অনেক পশ্চাদপদ । মৎস্যশিকারীদের মহিলাদের

টেবিল ৬ ঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিবারের প্রথম অংশগ্রহণের দশক

মৎস্য		১৯৫০ দশক ও পূর্বে	১৯৬০-৭০	১৯৭০-৮০	১৯৮০-৯০	মোট
শিকারী	জলদাশ	৩৪ (১০০)	০	০	০	৩৪
	মুসলমান	০	১ (১০)	০	৯ (৯০)	১০
	মোট	৩৪ (৭৮)	১ (০২)	০	৯ (২০)	৪৪ (১০০)
ডিম সংগ্রহকারী	মোট	৫৭ (৯০)	৬ (১০)	---	---	৬৩ (১০০)

সূত্র ঃ মাঠ জরিপ, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৫ ।

টেবিল ৭ ঃ পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

সদস্য	নিরক্ষর		পড়তে ও লিখতে পারে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী				তদুর্ধ		মোট	
	ডিম সংগ্রহকারী	মৎস্য সংগ্রহকারী	ডিম সংগ্রহকারী	মৎস্য সংগ্রহকারী	ডিম সংগ্রহকারী	মৎস্য সংগ্রহকারী	ডিম সংগ্রহকারী	মৎস্য সংগ্রহকারী	ডিম সংগ্রহকরী	মৎস্য সংগ্রহকারী
পুরুষ	৪০ (১৯)	৫৭ (৩৫)	১৮ (৮)	৩৬ (২২)	১০৫ (৫০)	৬৪ (৪০)	৪৮ (২৩)	৬ (৩)	২১১ (১০০)	১৬৩ (১০০)
মহিলা	৪২ (২৬)	৭৪ (৫০)	৩৭ (২২)	২৫ (১৭)	৪৮ (৩০)	৪৬ (৩১)	৩৭ (২২)	২ (০১)	১৬৪ (১০০)	১৪৭ (১০০)
মোট	৮২ (২২)	১৩১ (৪০)	৫৫ (১৪)	৬১ (২০)	১৫৩ (৪১)	১১০ (৩৬)	৮৫ (২৩)	৮ (০৪)	৩৭৫ (১০০)	৩১০ (১০০)

মধ্যে আবার নিরক্ষরতার হার শতকরা ৫০ যা ডিম সংগ্রহকারীদের মধ্যে শতকরা ২৬ সে তুলনায় পুরুষদের নিরক্ষতার হার যথাক্রমে শতকরা ৩৫ ও শতকরা ১৯ ।

পরিবারের খাদ্য প্রাপ্তির অবস্থা পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে মৎম্যশিকারী সম্প্রদায় পোনা সংগ্রহকারীদের চেয়ে অধিক দুর্দশাপন্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করে । (টেবিল - ৮) ।

তাদের কোন পরিবারেই উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকে না এবং প্রায় ৬০ শতাংশ পরিবারে খাদ্য ঘাটতি হয় । তাদের মধ্যে আবার জেলে সম্প্রদায় অনেক বেশী দুর্দশাপন্ন ।

উপরের সকল সূচক থেকে এ ধারণা স্পষ্ট হয় যে আর্থসামাজিক অবস্থা বিচারে হালদায় মৎস্যশিকারীরা পোনা সংগ্রহকারীদের চেয়ে নিম্তর অবস্থানে রয়েছে । মৎস্যশিকারীদের মধ্যে জলদাস সম্প্রদায় আবার

টেবিল ৮ ঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিবারের খাদ্য প্রাপ্তির অবস্থা

	পোনা আহরণকারী পরিবার					মৎস্য শিকারী পরিবার				
উদ্বৃত্ত		ঠিক যথেষ্ট ঘাটতি	সময় সময় ঘাটতি	প্রায়শ	মোট	উদ্বৃত্ত	ঠিক যথেষ্ট	সময় সময় ঘাটতি	প্রায়শ ঘাটতি	মোট
১৪ (২২)		২৯ (৪৭)	১১ (১৭)	৯ (১৪)	৬৩ (১০১)	০	১৯ (৪৩)	৬ (১৪)	১৯ (৪৩)	৪৪ (১০০)

টীকা ঃ বন্ধনী মধ্যেকার সংখ্যা শতাংশ জ্ঞাপক ।

সূত্র ঃ মাঠ জরিপ ।

মৎস্য শিকারে ইদানিংকালে যোগদানকারী মুলমান জেলেদের চেয়ে অনেক পশ্চাদপদ। এই সম্প্রদায়ের সংগে গোটা বাংলাদেশের অন্যান্য অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে নিয়োজিত জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। এ ব্যাপারে শেষোক্তদের সম্পর্কে BARC-CIRDAP Workshop on Socio-economic Aspects of Fishing Community in Bangladesh এ মন্তব্য করা হয়েছে যে, এরা সামাজিকভাবে হীনতর এবং এদের বিপুল অংশ সম্পদহীন দরিদ্র। আমাদের জরিপেও ঐতিহ্যবাহী জলদাস গোত্রের পেশাজীবী জেলেদের হতদরিদ্র অবস্থার প্রতিফল দেখা যায়। এতে অন্তর্ভূক্ত জলদাস মৎস্যশিকারী ও অন্যান্য (মুসলমান) মৎস্যশিকারীদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান ।

এখানে উল্লেখ্য, মুসলমান সম্প্রদায় গত শতকের আশির দশক থেকে মৎস্যজীবী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির তুলনায় অধিক হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এর প্রধান কারণ। এখনও এ সম্প্রদায়ের লোকেরা সমাজে নিজেদের জেলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করে। তা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে তারা মৎস্যশিকারে অধিকতর জড়িয়ে পড়ছে। মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের এরকম দুর্দশাপন্ন জনগণ এবং জলদাস সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীরাই হালদার উপর নির্ভরশীল। এরাই হালদায় মূল মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। এদের বাইরেও হালদা পারের বহু লোক নিজেদের পরিবারের খাবার জন্য মাঝে মাঝে এ নদীতে মাছ ধরে। অন্য কিছু লোক আছে যারা তুলনামূলকভাবে ধনী। এরা ছিপ বড়শিসহ উন্নত অন্যান্য যন্ত্র দিয়ে মাঝে মাঝে মাছ শিকার করে। হালদার দক্ষিণাংশে গলদা চিংড়ি ধরার জন্য বড়শির ব্যবহার বেশ বিস্তৃত। চিংড়ি পোনা আহরণের মৌসুমে বাইরের ব্যবসায়ীরাও এখানকার জেলেদের নিয়োগ করে।

মৎস্য শিকারে হালে যোগদানকারী নবীন জেলেরা ঐতিহ্যবাহী জাল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে পারদর্শিতা নিয়ে এ কাজে যোগদান করেনি। উপরন্তু, ঐতিহ্যগতভাবে মৎস্যশিকারে জড়িত না থাকায় মৎস্য সংরক্ষনের সহায়ক কিছু কিছু বিষয়ে এরা অনভিজ্ঞ। এমতাবস্থায়, এদের যোগদানের ফলে নতুন ক্ষতিকারক জালের ব্যবহার যেমন দ্রুত বেড়ে গেছে তেমনি নদীতে মা মাছের সংরক্ষনের বিষয়টি উপেক্ষিত হচ্ছে। ছোট ছোট আকারের মূল্যবান মাছ সংগ্রহে কোন বাচবিচার করা হচ্ছে না।

বস্তুতঃপক্ষে নদীতে মাছের ভান্ডার হ্রাস পাওয়ার কারণে সকল জাতের সকল আকারের মাছ ধরার জন্য নতুন নতুন ভাবে জাল ও ফাঁদের (৪.৫ সি. মি. এর ছোট) প্রচলন হতে থাকে। এর অনেকগুলি আইনের চোখে অবৈধ। কিন্তু আইন প্রয়োগে শৈথিল্য এবং মৎস্যশিকারে ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিপালিত সংরক্ষনমূলক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে নবাগত প্রজন্মের মৎস্যজীবীদের অজ্ঞতা ও তা প্রতিপালনে অবহেলার কারণে হালদায় মৎস্য উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় হল, ইদানিংকালে নবাগতদের দেখাদেখি ঐতিহ্যবাহী জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্ষতিকর জালের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। মৎস্য সংরক্ষণ বিষয়ে এ সম্প্রদায় কর্তৃক এতকাল ধর্মজ্ঞানে প্রতিপালিত প্রথাগুলি পালনে অনীহা দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং পাশাপাশি অন্যান্যদের মৎস্য শিকারে ক্ষতিকর উপায় অবাধে অবলম্বন করার উদাহরণ উভয়ই দায়ী। উল্লেখযোগ্য, তাদের সংগে আলোচনায় জানা যায়, তাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগই অবৈধ উপায় অবলম্বনে এখন মূল প্রতিবন্ধক। বংশপরম্পরায় প্রতিপালিত সংরক্ষণ নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা তত বড় প্রতিবন্ধক নয়।

প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও মৎস্য আইন

বাংলাদেশের নদীতে মৎস্য শিকার এখন ১৯৫০ সালের Protection and Conservation of Fish Act দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আইনটি ২০০২ সালে সংশোধন করা হয়। এতে নদী, মৎস্য কর্মকর্তা এবং মাছধরার জাল ইত্যাদির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে বিস্তারিতভাবে। মাছ ধরার জালের মধ্যে সকল তন্তু দিয়ে তৈরী সকল আকারের ঘর সম্পন্ন জালকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কারেন্ট জাল নামক আরেকটি জালকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে monofilament synthetic fiber দিয়ে তৈরী সকল আকারের ঘরসম্পন্ন জাল হিসাবে। আইনের ৪ ক ধারায় কারেন্ট জালের উৎপাদন, বয়স আমদানী, বাজারজাতকরণ, গুদামজাতকরণ, স্থানান্তর, পরিবহন, অধিকার, মালিকানা এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৫ ক ধারায় এ জাল ধরা ও বাযেয়াপ্ত করার বিধান ও তা কার্যকর করার জন্য ৫ ধারায় মৎস্যকর্মকর্তাকে পুলিস কর্মকর্তার মত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আইনে ৪.৫ সে. মি. এর ছোট ঘর সম্পন্ন সকল জালকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনের এ সব ধারায় কোন ব্যবস্থা নেয়ার ঘটনা আমাদের জরিপে পাওয়া যায়নি।

এখানে উল্লেখযোগ্য, কারেন্ট জাল ছাড়া বর্তমানে হালদায় ব্যবহৃত অন্য কয়েকটি জালও ফাঁদকে এখানকার লোকজন ক্ষতিকর হিসাবে সনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে ভাসান জাল, বড়শি ও ঘিরাজাল উল্লেখযোগ্য। কার্প জাতীয় মাছসহ খুব বড় আকারের মাছ শিকার করার জন্য এ গুলি ব্যবহৃত হয় এবং মূলতঃ এরকম জাল ব্যবহারের কারণে হালদা ক্রমাগতভাবে মা মাছ শূন্য হয়ে পড়ছে বলে স্থানীয়দের ধারণা। কিন্তু এ গুলি নিষিদ্ধ করে কোন আইন চালু আছে বলে জানা যায়নি। অন্যদিকে ঘিরা বা খোর জাল নামক জাল নদীর ধারে ধারে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে দেখা যায়। এর ঘরগুলি আইনে নির্ধারিত ক্ষুদ্রতম ঘর থেকে অনেক ছোট। এ গুলির ব্যবহারে নদিতে সকল প্রজাতির মৎস্য পোনার ব্যাপক ক্ষতি এবং ফলে উৎপাদন বিপুলাংশে হ্রাস পেয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু এ গুলি নিয়ন্ত্রণের কোন নিয়মিত প্রয়াস দেখা যায় না। এভাবে কোন ক্ষেত্রে আইনে নিষিদ্ধ নয় এমনজাল, আবার কোনক্ষেত্রে আইনতঃ নিষিদ্ধ অথচ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা হয় না এমন জালের অবাধ ব্যাপক ব্যবহার হালদার মৎস্যক্ষেত্র ব্যবস্থাপনায় কোন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতির পরিচয় বহন করে না। কিন্তু বাস্তবে হালদা অঞ্চলে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠানিক (উপজেলা মৎস্যকর্মকর্তার কার্যালয়) উপস্থিতি সর্বজন বিদিত।

বর্তমানে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এসব কার্যালয়ের তৎপরতার মধ্যে প্রতিবছর মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনের সময় এলাকায় ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। এর সংগে উপজেলা নির্বাহী কর্মমর্তার মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলার সকল কর্মকর্তাকে জড়িত করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দও জড়িত হন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে। জনসভা অনুষ্ঠান ও লিফলেট বিলি করে আইনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়। হাটে ঢোল সহবৎ করেও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সর্বোপরি ঘোষণা দেয়া হয় যে আইনের অবমাননার জন্য শাস্তির বিধান করা হবে। কিন্তু এ বছরও, অন্যান্য বছরের মত, মৎস্য সপ্তাহে ঘোষিত কর্মসূচীর আরদ্ধ অনুসরণ (follow-up) করা হয়নি। কারণ হিসাবে, সরকারী বরাদ্দের অভাবের কথাই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রচার ও বাস্তবে তা অনুসরণে ফাঁক আইন প্রতিপালনে সাধরণ মানুষকে উত্তরোত্তর অমনযোগী করে তুলবে এ দেশের অন্যান্য খাতও অন্যান্য দেশের নজির থেকে এ ধারণা পাওয়া যায়।(৩)। এ ছাড়া, নদীতে আইনের যে ধারাগুলি লঙ্ঘনের নজির খোঁজার জন্য হালদা অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না বা যেগুলি বাংলাদেশের সব জলাশয়ের মত এখানেও লঙ্ঘিত হয়ে আসছে সে গুলি হচ্ছে ঃ

(১) জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্প জাতীয় মাছের ৯ ইঞ্চি থেকে ছোট মাছ ধরা;
(২) নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত পাঙ্গাস মাছের ৯ ইঞ্চি থেকে ছোট মাছ ধরা;
(৩) ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত বোয়াল ও আইড় মাছের ১২ ইঞ্চি থেকে ছোট মাছ ধরা

আইনের এ সব ধারা বাস্তবে প্রতিপালন নিশ্চিত করা যতই জটিল ও ব্যয় সাপেক্ষে হোক না কেন আইনের প্রয়োজন যে রয়েছে সে সম্পর্কে কোন মতদ্বৈদতা নেই। আইন আছে এবং থাকা বাঞ্চনীয়। আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগের মধ্যে বিদ্যমান ফাঁক কমিয়ে আনার বিষয়টির প্রতি আশু দৃষ্টি কাম্য।

একবার আমাদের মাঠ পরিভ্রমণের সময় একজন উপজেলা কর্মকর্তাও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে সংগী হিসাবে পেয়েছিলাম। অজিমের ঘাট নামক জায়গায় দূর থেকে নৌকা দিয়ে জাল পাতার দৃশ্য দেখে আমরা কাছে গিয়ে তা সনাক্ত করার সিদ্ধান্ত নিই। চেয়ারম্যান সাহেবের অনুরোধে স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের একজন কর্মকর্তা আমাদের সংগে যোগ দেন। আমাদের নৌকা জেলে নৌকার কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতেই একটি নৌকা পালিয়ে যায়। অন্য একটি নৌকা আমরা জেলেসহ পেয়ে যাই। সে নৌকা থেকে ভাসান জাল পাতা হচ্ছিল। নৌকার গলুইয়ে আমরা কার্পজাতীয় মাছের বড় বড় আঁইস দেখতে পাই। উপজেলা কর্মকর্তা জালটি বাজেয়াপ্ত করেন। কাছাকাছি জায়গায় আরও একটি জাল পাতা ছিল। সেটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। আইনের কোন ধারায় ভাসান জাল নিষিদ্ধ তা জানা যায়নি। তবে জালটি যে ক্ষতিকর এটি নিশ্চয় জেলেরাও সম্যক বুঝে। একজন জেলের এ রকম পালিয়ে যাওয়া এবং অন্যজনের আত্মসমর্পন থেকে ধারণা করা যায় যে জাল ক্ষতিকর হলে স্বীকৃত ব্যবহারকারী আইনের ফাঁকফোকরের সুবিধা নেয়ার কথা মনেও আনে না। ভবিষ্যতে হালদা ব্যবস্থাপনায় যে কোন উদ্যোগের জন্য একটি এক ভাল খবর।

আশার রূপালি রেখা

হালদার সুষ্ট ব্যবস্থাপনার অভাব, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের দুর্বলতা ও অবক্ষয় এবং সংরক্ষনের ক্ষেত্রে আইনী বেষ্টনীর শৈথিল্য হালদার মৎস্যসম্পদের ক্রমাবনতির জন্য দায়ী। তা সত্ত্বেও এ অঞ্চলের মৎস্যজীবীসহ সকল স্বার্থগোষ্ঠী, প্রশাসন, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সমাজিক নেতৃত্বের সংগে হালদার পুনরুদ্ধার বিষয়ে মতবিনিময় ভবিষ্যতের হালদা সম্পর্কে পুণঃরায় আশাবাদী হয়ে উঠতে সাহয্য করে। এখানে উল্লেখ্য, সরকারী উদ্যোগে এ ব্যাপারে কিছু কার্যক্রম গ্রহণের খবর এলাকায় বেশ উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। সকল শ্রেণীর মৎস্যজীবী নিজ নিজ ভূমিকা পালনের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। বৃহত্তর স্বার্থাগোষ্ঠী (stakeholder) সমাজ হালদার পুণরুদ্ধারের মধ্যে তাদের উজ্বল ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পায়।

সাধারণ মানুষ হালদার এতকালের অবক্ষয়ের জন্য সরকারী ভুমিকার অনুপস্থিতিকে বেশী করে দায়ী করে। তাদের মতে সরকার চাইলে সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে হালদার ক্ষতিকর ব্যবহার ঠেকানোর জন্য স্বেচ্ছায় স্থানীয় উদ্যোগ গড়ে উঠবে। এ ব্যাপারে স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সংগে ব্যাপক মত বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা যায়। সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক প্রতিনিধিবৃন্দ, স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় স্বার্থগোষ্ঠীসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের প্রতিনিধিদের যৌথ উদ্যোগই এ সমস্যা মোকাবিলার প্রকৃষ্ট উপায়। মূলতঃ মৎস্য অধিদপ্তরের অধিনে পরিচালিত উদ্যোগে যারা মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারেন মানের

(rank) ক্রমানুসারে তাদের চিহ্নিত করা যায় । ১ । ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃবৃন্দ, ২ । উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ৩ । স্থানীয় মৎস্যজীবী নেতৃত্ব, ৪ । স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ, ৫ । ও. সি., ৬ । আনসার/ভি. ডি.পি., ৭ । উপজেলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ৮ । সমন্বয়কারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ।

যে ধরণের পদক্ষেপ এ ব্যাপারে প্রারম্ভিক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

১ । প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন অথবা প্রণয়ন সাপেক্ষে বর্তমান অবস্থা মোকাবিলার জন্য ক্ষতিকর সকল জাল বা যন্ত্র অবৈধ ঘোষণা;

২ । প্রজনন কালে মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ আইনসহ ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই সকল আইন রবাস্তবায়ন;

৩ । এ সময় নদীতে প্রয়োগের জন্য গৃহীত সকল বিধি নিষেধ প্রতিপালন নিশ্চিত করণ;

৪ । নদীর প্রায় বৃত্তাকার অংশ (খড়ড়ঢ়) ধ্বংসের সকল বেসরকারী হস্তক্ষেপ নিধারণ;

৫ । সরকারী উদ্যোগে নদীর পাড়ে উন্নত হ্যাচারী তৈরীর মাধ্যমে মাঠির খাদ ব্যবহার বন্ধে উদ্বুদ্ধকরণ;

এখানে উল্লেখ্য, বছরের একটি বড় অংশ জুড়ে মৎস্যশিকার নিষিদ্ধ করা এবং অন্যান্য সময়ে অনেকগুলি (ক্ষতিকর) জাল নিষিদ্ধ করার ফলে পেশাজীবী মৎস্যজীবীরা জীবিকাহীন হয়ে পড়বে । এদের অনেকেই হালদার উপর নির্ভরশীল । পেশাজীবী জেলেদের জন্য আগে থেকেই বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা ভেবে দেখতে হবে ।(৪,৫) । যতদিন এ রকম কোন উপায় বের করা সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত তাদের জন্য খাদ্য রেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে । আমাদের জরিপে এ রকম পরিবারের সংখ্যা ৪০০ (চারশ) । বিকল্প কর্ম সংস্থানের জন্য স্থানীয় এন. জি. ও দের সাহায্যে জরিপে সমাজিক বনায়ন, মৎস্যচাস, হাঁস মুরগী পালন, যানবাহন এবং নদী থেকে বালি উত্তোলন প্রভৃতি খাতগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে । এসব নতুন কর্মক্ষেত্রে একটি বড় জনগোষ্ঠী কে আস্তে আস্তে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হলে হালদার মৎস্যক্ষেত্র পুনরুদ্ধার হবে একটি বাস্তবায়নযোগ্য দীর্ঘকালীন লক্ষ্যবস্তু । এর বাস্তবায়নে সকল স্বার্থগোষ্ঠীকে সমন্বিত করে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন । (৬) । বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের অশ্বনুরাকৃতি হ্রদে যৌথ ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন নদীতে সম্প্রদায়ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে অনুকরণীয় উদাহরণ হতে পারে ।

References

1. Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. *Science* 162:1243-1248.
2. BARC-CIRDAP Workshop on Socio-economic Aspects of Fishing Community in Bangladesh.
3. Ida Siason, 2004. The Effect of C0-Management Processes on Enforcement and Compliance with Fisheries Regulations, WFC, Dhaka.

   Bangladesh. ICLARM, Dhaka.
4. CODEC, 1997. Identification of Non- Capture Fisheries I Options for the ESBN Fisheries of Coastal Bangladesh, Chittagong.
5. COFCON, 2003. Identification of Alternative Income and Employment generation Activities for the Costal Fisher-Folks of Bangladesh, Dhaka.
6. M. S. Khan and N. A. Apu, 1998, Fisheries Co-Management in the Ox bow Lakes of
7. P. Thompson and M.Ahmed, 2004, Lessons from CBFM1, WFC, Dhaka.